মহাকাব্য ঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

রামায়ণ ও মহাভারতের পর লৌকিক সংস্কৃতে কলামণ্ডিত অলংকৃত মহাকাব্যের প্রথম উদ্ভব কখন কিভাবে ঘটেছিল তার কোন সঠিক তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের সুবর্ণযুগে কালিদাসের প্রতিভার দীপ্তিতে সংস্কৃত মহাকাব্যের যে মহত্ত্বমণ্ডিত রূপ আমরা পাই তার উদ্ভবের ইতিহাস সম্পূর্ণই অনুমান নির্ভর। রামায়ণ-মহাভারত এবং কালিদাসের মধ্যবর্তীকালে একমাত্র অশ্বঘোষের রচনা ছাড়া অন্য কোন কবিকৃতি পাওয়া যায় নি। প্রাক্-কালিদাসীয় যুগে সংস্কৃত মহাকাব্যের শ্রীবৃদ্ধির তেমন কোন সংশয়াতীত প্রমাণ না থাকায় অনেকে সেই সময়কে অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করে থাকেন। কিন্তু বহিরাক্রমণ, অনুকূল পরিবেশের অভাব প্রভৃতি কারণ থাকলেও সে সময় কাব্যলক্ষ্মী প্রসুপ্ত ছিলেন—একথা মানা যায় না। পুরাণোত্তর যুগে ছন্দ ও কাব্যচর্চার যে সকল নিদর্শন বর্তমান তার থেকে সে যুগের কাব্যচর্চার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আলংকারিক ভামহের 'কাব্যালংকার' গ্রন্থের নমিসাধু রচিত টীকায় (২/৮) পাণিনির "পাতালবিজয়" নামক মহাকাব্য থেকে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। বৃহস্পতি রায়মুকুট বিরচিত অমরকোষের 'পাদচন্দ্রিকা' টীকায় পাণিনির "জাম্ববতীবিজয়" থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে। সদুক্তিকর্ণামৃতে পাণিনি-রচিত শ্লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'সুবৃত্ততিলক' থেকে জানা যায় যে, পাণিনি উপজাতি বৃত্ত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এই পাণিনি সত্য সত্যই যদি অষ্টাধ্যায়ীর রচয়িতা পাণিনি হন, তবে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে—খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতকেও সংস্কৃতে মহাকাব্য রচনার ধারা অব্যাহত ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আবির্ভূত বার্তিককার বররুচির "কণ্ঠাভরণ" কাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বররুচির কাব্যের নাম এবং অনেক কাব্যধর্মী শ্লোক উল্লিখিত হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক পতঞ্জলির স্থিতিকাল রূপে চিহ্নিত। সুতরাং ঐ সময়েও মহাকাব্য রচনার ধারা অব্যাহত ছিল। পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্রে বিদ্যমান ছন্দোবৈচিত্র্যও সংস্কৃত মহাকাব্য ধারার প্রাচীনত্বের প্রমাপক। এই সকল তথ্য থেকে একথা স্পষ্ট যে, অশ্বঘোষ-পূর্ব যুগেও মহাকাব্য রচিত হয়েছিল। তবে সেই সকল কবিকৃতি আজ কালগর্ভে বিলীন। চির প্রবহমান সেই মহাকাব্যের স্রোতোধারায় অভিসিঞ্চিত হয়ে অশ্বঘোষ প্রমুখ কবিদের হাতে সংস্কৃত মহাকাব্য ক্রমশঃ পল্লবিত হয়েছে।

অশ্বঘোষ ও তাঁর রচনাবলী

প্রাক-কালিদাসীয় যুগের কবিরূপে অশ্বঘোষের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের সম্রাট কুশানরাজ কণিষ্কের সমসাময়িক রূপে অশ্বঘোষের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং কণিষ্কের স্থিতিকালকে অশ্বঘোষের প্রতিভা বিকাশের কালরূপে চিহ্নিত

করা হয়। নাগার্জুন, অশ্বঘোষ এবং বসুমিত্র—এই তিন বৌদ্ধ লেখক কণিষ্কের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত বলে ভিনসেন্ট স্মিথ অভিমত পোষণ করেছেন। কবি, দার্শনিক, পণ্ডিত এবং ধর্মপ্রবক্তা রূপে অশ্বঘোষ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

বিভিন্ন কিংবদন্তী থেকে অশ্বঘোষের জীবনেতিহাসের কিছু তথ্য জানা যায়। চীনদেশে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে অশ্বঘোষ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি আসক্ত হয়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম ছিল সুবর্ণাক্ষী এবং তাঁর বাসস্থান ছিল সাকেত। কবি অশ্বঘোষ বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারত, জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের নিদর্শন স্পষ্ট। আচার্য, মহাবাদী, ভদন্ত, মহাকবি প্রভৃতি বিশেষণে তিনি ভূষিত ছিলেন। বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ, শারিপুত্রপ্রকরণ, গণ্ডীস্তোত্রগাথা, বজ্রসূচী, সূত্রালঙ্কার এবং মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদসূত্র অশ্বঘোষের উল্লেখযোগ্য রচনা। এগুলির মধ্যে 'বুদ্ধচরিত' ও সৌন্দরনন্দ হল মহাকাব্য, শারিপুত্রপ্রকরণ হল প্রকরণ জাতীয় দৃশ্যকাব্য এবং গণ্ডীস্তোত্রগাথা খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্য। অপরাপর গ্রন্থগুলি অশ্বঘোষের রচনা কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।

বুদ্ধচরিত ঃ—অশ্বঘোষের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতির নিদর্শন হল বুদ্ধচরিত নামক মহাকাব্য। গ্রন্থের নামকরণ থেকে একথা স্পষ্ট যে, বুদ্ধের জীবনীই এই মহাকাব্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থটির সর্গসংখ্যা সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং এর মতে বুদ্ধচরিত ২৮টি সর্গে নিবদ্ধ। তিব্বতী ভাষার অনুবাদে ২৮টি সর্গের পরিচয় পাওয়া গেলেও চীনা ভাষায় মাত্র ২০টি সর্গের অনুবাদ পাওয়া যায়। ভারতে উপলভ্যমান বুদ্ধচরিতে ১৭টি সর্গ পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, এর শেষ চারটি সর্গ অমৃতানন্দ নামক কোন এক কবির রচনা। সিদ্ধার্থের জন্ম থেকে নির্বাণ লাভ পর্যন্ত বুদ্ধের ঘটনাবহুল ও মহত্ত্বমণ্ডিত জীবনবৃত্তান্ত এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। কপিলাবস্তুর শাক্যবংশে রাজা শুদ্ধোদনের পুত্ররূপে সিদ্ধার্থের জন্ম, যশোধরার সঙ্গে তাঁর বিবাহ, বিষয়ভোগে সিদ্ধার্থের উদাসীনতা, নগরভ্রমণে বেরিয়ে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর বাস্তব চিত্র দর্শনে সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে বোধ, সৌম্যমূর্তি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীকে দেখে অন্তরে বৈরাগ্যের সূচনা, গভীর রাত্রে সুপ্ত তরুণীদের অবস্থা দর্শনে বিতৃষ্ণায় তাঁর গৃহত্যাগের সঙ্কল্প, সারথি ছন্দকের রথে আরোহণ করে গৃহত্যাগ, সিদ্ধার্থের অভাবিত পরিবর্তনে রাজধানীর বিশেষতঃ অন্তঃপুরের হাহাকার, যশোধরার বিলাপ, সত্যান্বেষণে সিদ্ধার্থের দেশ-পর্যটন, সাধনায় 'মার'-দানবের বাধাদান, মার-বিজয়, অবশেষে সাধনার দ্বারা নির্বাণ বা বুদ্ধত্বলাভ—এই সকল ঘটনার মহাকাব্যোচিত বর্ণনায় গ্রন্থটি সমৃদ্ধ।

মহাকবি অশ্বঘোষ ভগবান্ বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্তকে কাব্যের রসে অভিষিক্ত করে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। এই মহাকাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, সাংখ্যদর্শন, ব্যাকরণ, অলংকার প্রভৃতি শাস্ত্রে কবির

Scanned with CamScanner

অনায়াস দক্ষতা। বৈদর্ভী রীতির কবি অশ্বঘোষের ভাষা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ও প্রসাদ গুণযুক্ত। শব্দপ্রয়োগের চাতুর্যে, অলংকারের ঔচিত্যে, ছন্দের সুষমায় এবং শব্দের ঝঙ্কারে কাব্যটি সহজে সহৃদয় পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট করে। দার্শনিক রূপেও তাঁর চিন্তা সরল ও হৃদয়গ্রাহী। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দর্শনের গূঢ় তত্ত্ব প্রতিপাদন করতে গিয়ে কাব্যের স্বচ্ছতা কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। মূলতঃ জগতের যথার্থ কল্যাণ ও সদ্ধর্ম সম্পর্কে পাঠকবর্গকে অবহিত করার জন্যই তাঁর এই মহাকাব্য রচনার প্রয়াস। তাঁর রচনায় রামায়ণের প্রভাব বহুস্থলে স্পষ্ট। যেমন—পুত্র-বিরহাতুর শুদ্ধোদনের পিতৃহৃদয়ের হাহাকারের মধ্যে পুত্রশোকাতুর দশরথের এবং যশোধরার বিলাপে সীতার দুঃখের ছায়া অনায়াসলক্ষ্য। পিতার বাৎসল্য, পত্নীর একনিষ্ঠ প্রণয়, পুরাঙ্গনাদের বিলাস, মারদানবের প্রলোভন, করুণাঘন গৌতমের অভিনিষ্ক্রমণ—প্রভৃতির বর্ণনা চিত্তাকর্ষক। শান্তরস প্রধান এই মহাকাব্যে শৃঙ্গার, করুণ, বীভৎস, রৌদ্র প্রভৃতি অঙ্গরসের সন্নিবেশ-চমৎকারিত্বে কবি অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

সৌন্দরনন্দ ঃ—সৌন্দরনন্দ অশ্বঘোষের আর একখানি মহাকাব্য। এটি কবির দ্বিতীয় রচনা বলে পণ্ডিতদের অনুমান। কিন্তু অধ্যাপক কীথ গ্রন্থটিকে কবির কাব্যরচনার প্রথম প্রয়াস বলে মনে করেন। কাব্যটি অষ্টাদর্শ সর্গে বিভক্ত। কপিলাবস্তু নগরী প্রতিষ্ঠার বর্ণনা দিয়ে কাব্যটির সূত্রপাত। বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও বুদ্ধের নির্দেশে সেই ধর্মের প্রচার এই কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয়।

শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের দুই পুত্র—সর্বার্থসিদ্ধ এবং নন্দ। তাঁরা বৈমাত্রেয় ভাই। সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করে বুদ্ধত্ব লাভ করলেন। নন্দ সুন্দরীনাম্নী এক পরমা রূপসীর পাণিগ্রহণ করে সংসারী হলেন। নন্দ তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি প্রবল আসক্ত ছিলেন। বুদ্ধদেব অনিচ্ছুক নন্দকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। ধর্মান্তরিত স্বামীর জন্য সুন্দরীর শোক নিবিড় হল। পতিপ্রাণা তরুণী স্ত্রীর বিলাপে অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত নন্দের দোলায়মান চিত্তের বর্ণনা বড়ই মর্মস্পর্শী। বুদ্ধ তাঁকে বোঝালেন যে, রমণীর রূপ ও সৌন্দর্য অসার, ঐহিক সুখভোগও ক্ষণিক। এমন কি আপাতরম্য স্বর্গসুখও পারত্রিক ফলদায়ী নয়। এভাবে নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত নন্দের জীবনে নির্বাণের আগ্রহ জাগে। বুদ্ধের আদেশে তিনি জগতের কল্যাণের জন্য নির্বাণের অমৃতময় বাণী প্রচারে ব্রতী হন।

কবির সহজাত প্রতিভা ও দার্শনিক প্রজ্ঞার বিরল সমন্বয় ঘটেছে সৌন্দরনন্দ মহাকাব্যে। গ্রন্থের শেষে কবি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, মোক্ষই একমাত্র পরমার্থ, তাই তিনি কাব্যের ছলে তত্ত্বকথা পরিবেশন করেছেন—"কাব্যব্যাজেন তত্ত্বং কথিতমিহ ময়া মোক্ষঃ পরিমিতি।" বৌদ্ধতত্ত্বের ব্যাখ্যার জন্যই কবি কাব্যরীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তবুও তিনি কাব্যধর্ম থেকে বিচ্যুত হন নি। সৌন্দরনন্দ মহাকাব্যে একদিকে যেমন বর্ণিত হয়েছে কামকলার উচ্ছলতা, অপরদিকে তেমনি উপস্থাপিত হয়েছে নিগূঢ় দার্শনিক

তত্ত্বের বিশ্লেষণ। শেষের কয়েকটি সর্গে কবি ধর্মপ্রবক্তার ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয়েছেন। এখানে কবি অশ্বঘোষ অপেক্ষা দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারক অশ্বঘোষের উপস্থিতি প্রখর। অথচ কী সহজ তাঁর বক্তব্য, কী আন্তরিক তাঁর বর্ণনা। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ উপমা, রূপক প্রভৃতি অলংকার প্রয়োগে, কাহিনী উপস্থাপনায়, বিচিত্র ছন্দের প্রয়োগনৈপুণ্যে, বর্ণন কুশলতায় 'সৌন্দরনন্দ' যথার্থই মহাকাব্য হয়ে উঠেছে।

মহাকাব্যের ক্রমবিকাশের ধারাপথে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হল। কিন্তু অশ্বঘোষের রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ বিবরণের জন্য এই কবির অন্যান্য কবিকৃতির আলোচনাও অপেক্ষিত। তাই তাঁর অন্যান্য রচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হল।

শারিপুত্রপ্রকরণ ঃ—শুধু মহাকাব্য রচয়িতা রূপে নয়, নাট্যকার রূপেও অশ্বঘোষের প্রসিদ্ধি সমধিক। তাঁর রচিত শারিপুত্রপ্রকরণ নয় অঙ্কের প্রকরণ জাতীয় দৃশ্যকাব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এর খণ্ডাংশ মাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ল্যুডার্সের সম্পাদনায় সেই খণ্ডাংশ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। বুদ্ধের নিকট শারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ এই প্রকরণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বুদ্ধ জাতিতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু শারিপুত্র ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হয়ে ক্ষত্রিয়ের কাছে দীক্ষাগ্রহণ উচিত কিনা—শারিপুত্রের এই জিজ্ঞাসার উত্তরে মৌদ্‌গল্যায়ন বলেন যে, ক্ষত্রিয়ের কাছে ব্রাহ্মণের দীক্ষা গ্রহণ অনুচিত। কিন্তু শারিপুত্রের অন্তরে তখন জেগেছে বোধিলাভের তীব্র ব্যাকুলতা। তিনি প্রবল যুক্তি দ্বারা মৌদ্‌গল্যায়নের মতকে খণ্ডন করে বুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করেন। এরপর উভয়ে একত্রে মিলিত হয়ে বুদ্ধের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন।

এই প্রকরণ জাতীয় দৃশ্যকাব্যের রচনাভঙ্গী 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরনন্দ'—এই দুই মহাকাব্যের রচনারীতির সাদৃশ্যবাহী। এটিকে ভারতীয় নাট্যকৃতির উপলভ্যমান প্রথম নিদর্শন বলা চলে। ধর্মীয় চিন্তাধারায় প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও কবি নাট্যধর্ম থেকে বিচ্যুত হন নি।। নাটকটিতে বহু বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ আছে। শারিপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন প্রভৃতির পাশাপাশি ব্রাহ্মণ, পারিপার্শ্বিক, বিদূষক, শ্রমণ, মগধবতী, গণিকা, চেটি প্রভৃতি চরিত্রও উপস্থাপিত হয়েছে। নাটকে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃত ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নাটকটির অবদান অনস্বীকার্য।

গণ্ডীস্তোত্রগাথা ঃ—অশ্বঘোষ রচিত 'গণ্ডীস্তোত্রগাথা' উনত্রিশটি শ্লোকে নিবদ্ধ একমাত্র গীতিকাব্য। শ্লোকগুলি স্রগ্ধরা ছন্দে রচিত। বৌদ্ধমঠে গণ্ডী নামক এক বিশেষ বাদ্যযন্ত্র রাখা হত। তাতে কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা আঘাত করলে যে সুমধুর ধ্বনি সৃষ্টি হত, তা বৌদ্ধদের কাছে খুব পবিত্র বলে বিবেচিত হত। সেই ধ্বনির মর্মগত আবেদন এবং গণ্ডী নামক বাদ্যযন্ত্রের প্রশংসা করেই শ্লোকগুলি রচিত। Winternitz-এর মতে এটি অশ্বঘোষের সমসাময়িক কুমারলাটের রচনা। কাব্যের স্বরূপ, বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য বিচার করে অধিকাংশ পণ্ডিত গ্রন্থটিকে অশ্বঘোষের রচনা বলেই মনে করেন।

Scanned with CamScanner

কালিদাস

ব্যাস, বাল্মীকির পরেই ভারতবর্ষে যে কবির নাম পরম শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হয়, যাঁর রচিত কাব্য ও নাটকে সংস্কৃতসাহিত্য বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত তিনি ভারতের কবিকুলশিরোমণি, বাণীর বরপুত্র কালিদাস। অতীত দিনের কোন্ শুভ লগ্নে ভারতবর্ষের কোন্ জনপদ এই ক্ষণজন্মা কবির আবির্ভাবে কৃতার্থ হয়েছিল—এ বিষয়ে আজও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নি। পরস্পর বিবদমান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীরা কালিদাসের আবির্ভাব কাল ও জন্মভূমিকে কেন্দ্র করে বিবিধ যুক্তিজাল বিস্তার করলেও এর কোন সুনির্দিষ্ট মীমাংসা হয় নি। তাই রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে বলেছেন—

"হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল।
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।।"

কালিদাসের আবির্ভাব কাল সম্পর্কে সাধারণতঃ তিনটি মত প্রচলিত আছে—(১) প্রথম মত অনুসারে খ্রীঃ প্রথম শতকে উজ্জয়িনীরাজ শকারি বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালই কালিদাসের আবির্ভাবকাল। উইলিয়াম জোনস্, পণ্ডিত বলদেব উপাধ্যায়, পিটারসন্, এম. আর. কালে, আর. এন. আপ্তে প্রভৃতি পণ্ডিত এই মতের সমর্থক। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও বিভিন্ন যুক্তি দ্বারা এই মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন[১]। প্রসিদ্ধি আছে যে, শকারি বিক্রমাদিত্য ৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শকদের পরাজিত করে বিক্রমাব্দ বা সংবৎ বর্ষের প্রচলন করেন। কালিদাসের রচনারূপে প্রচলিত 'জ্যোতির্বিদাভরণ' নামক গ্রন্থের একটি শ্লোকে[২] কালিদাসকে বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্নরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এই মত সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ ৫৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যে সংবৎটির প্রচলন হয় তা বিক্রম-সংবৎ নয়। নবরত্নের বরাহমিহির ষষ্ঠ শতকের লোক। অমরসিংহও পরবর্তীকালের। 'জ্যোতির্বিদাভরণ' আদৌ কালিদাসের রচনা নয়।

(২) দ্বিতীয় মতানুসারে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালই কালিদাসের স্থিতিকাল। অধ্যাপক কীথ এই মতকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন[৩]। এই মতটিই অধিক সমর্থনযোগ্য। গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৮০-৪১৪ খ্রীঃ) হূণদের পরাজিত করে বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর এবং তাঁর পুত্র কুমারগুপ্তের (৪১৫-৪৫৫ খ্রীঃ) রাজত্বকালকে গুপ্তসাম্রাজ্যের সুবর্ণ যুগ নামে অভিহিত করা হয়। শিল্প, স্থাপত্য, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির ন্যায় সাহিত্যেও এ সময়

Scanned with CamScanner

সুবর্ণযুগ সূচিত হয়েছিল। কালিদাসের কাব্যে যে সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় তা গুপ্তসাম্রাজ্যের সুবর্ণযুগকেই মনে করিয়ে দেয়। কালিদাস এই সুবর্ণযুগেরই কবি প্রতিনিধি। রঘুবংশ মহাকাব্যে রঘুরাজগণের মাহাত্ম্যকীর্তন মূলক শ্লোকে "আসমুদ্রক্ষিতীশানাম্[১]" অংশটিতে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যবিস্তারের ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়। পণ্ডিতদের মতে রঘুর দিগ্বিজয়ে এবং মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের অশ্বমেধ যজ্ঞে 'সমুদ্রগুপ্তের যজ্ঞের প্রচ্ছায়া স্পষ্ট। অনেকের মতে 'কুমারসম্ভব' কাব্যের নামকরণের মধ্যেও কুমারগুপ্তের জন্মের প্রতিধ্বনি অনুমিত হয়। ডঃ বুহ্‌লার মনে করেন যে, বৎসভট্টি তাঁর 'মান্দাসোর শিলালিপিতে' কালিদাসকে অনুকরণ করেছেন। খ্রীষ্টীয় ৪৭৩ —৭৪ শতকে এই শিলালিপি রচিত হয়। কাজেই কালিদাসকে কোন মতেই ৪৭২ খ্রীষ্টাব্দের পরে আনা সমীচীন নয়[২]। কালিদাস তাঁর 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকে পূর্বসূরী ভাসের প্রশংসা করেছেন—'প্রথিতযশসাং ভাসসৌমিল্ল-কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কথং বহুমানঃ।" এই সকল প্রমাণ থেকে স্থির হয়েছে যে চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধের পূর্বে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত থেকে কুমার গুপ্তের স্থিতিকালের মধ্যে গুপ্তসাম্রাজ্যের সুবর্ণযুগেই কালিদাসের আবির্ভাব। অধ্যাপক Winternitz,[৩] Sten Konow[৪] প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই মতকে সমর্থন করেছেন।

(৩) তৃতীয় মতানুসারে কালিদাসের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী। Fergusson এই মতের প্রবক্তা। তাঁর মতে কালিদাস মালবরাজ যশোবর্মনের সমসাময়িক। যশোবর্মা খ্রীঃ ষষ্ঠ শতকে হূণদের পরাজিত করেছিলেন। রঘুর দিগ্বিজয়ে হূণদের পরাজয় বৃত্তান্তে তা প্রতিফলিত হয়েছে। ষষ্ঠ শতকের বরাহমিহির কালিদাসের সঙ্গেই বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভা অলংকৃত করেছিলেন। মল্লিনাথের মতে মেঘদূতে (শ্লোক-১৪) কালিদাস তাঁর বন্ধু 'নিচুল' এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বৌদ্ধ দার্শনিক 'দিঙনাগ'-এর কথা উল্লেখ করেছেন। এই দুই আচার্যের কাল আনুমানিক ৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দের সন্নিহিত সময়। Fergusson-এর এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে Maxmuller যে নতুন মতবাদ প্রচার করেন তা 'Theory of Renaissance' নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর মতে ভারতবর্ষে ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক আক্রমণের জন্যই খ্রীষ্ট জন্মের প্রথম কয়েক শত বছর সংস্কৃতে কোন সাহিত্য রচিত হয় নি। উজ্জয়িনীরাজ হর্ষ বিক্রমাদিত্যের হাতে খ্রীঃ ৫৪৪ শতকে শকরা বিতাড়িত হওয়ার পর খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকেই কালিদাসের প্রতিভা স্পর্শে সংস্কৃত সাহিত্যের বন্ধ্যা যুগের

১. রঘুবংশ, ১/৫
২. Die Indischen Inschriften, P–18
৩. HIL. Vol. III
৪. Das indische Drama, P–59

অবসান ঘটে। ফ্লীট নানা যুক্তিপ্রমান দ্বারা এই মতকে খণ্ডন করেছেন। Macdonell ও Fergusson-এর অনুমানকে অমূলক বলে তিনি প্রতিপন্ন করেছেন।[১]

মহাকবি কালিদাস তাঁর জীবনেতিহাসের কোন তথ্যই তাঁর কোন রচনায় উল্লেখ করেন নি। তাঁর জন্মভূমিকে কেন্দ্র করেও সৃষ্টি হয়েছে নানা বাদবিবাদ। প্রচলিত মতবাদ এই যে, বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় উজ্জয়িনীতে তিনি রাজসভাকবির পদে আসীন ছিলেন। মেঘদূতে উজ্জয়িনী নগরীর বর্ণনায় এই নগরীর প্রতি কবির প্রবল আকর্ষণ এই জনপ্রবাদকে আরও সুদৃঢ় করেছে। রঘুবংশ মহাকাব্যের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় রাজা রঘুর হাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের রাজন্যবর্গের পরাজয় চিত্রিত হলেও বঙ্গদেশীয় রাজাদের পরাজয়ের কাহিনী অনুপস্থিত। এর থেকে অনুমিত হয় যে বঙ্গদেশই ছিল কবির জন্মভূমি। কবির নামও তাঁর বাঙালীয়ানার পরিচায়ক। তবে এ সমস্তই অনুমান মাত্র। বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে কালিদাসের নাম এমনই সংশ্লিষ্ট যে উভয়কে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে রূপকথার মত অজস্র কল্পিত কাহিনী, অসংখ্য কিংবদন্তী সৃষ্টি হয়েছে।

কালিদাসের নামে প্রচলিত গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশের অধিক হলেও মহাকবির কবিমানসিকতার গৌরবোজ্জ্বল পরিচয় নিহিত আছে তাঁর সাতটি কবিকৃতির মধ্যে। এই সাতটি রচনাই কালিদাসের লেখনীপ্রসূত বলে পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত। এই সাতটি কবিকৃতি হল—ঋতুসংহার ও মেঘদূত—এই দুটি খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্য, কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ নামক দুটি মহাকাব্য এবং তিনখানি দৃশ্যকাব্য—মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয় এবং অভিজ্ঞানশকুন্তল। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ, দর্শন, কামশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, সঙ্গীত, কলা, চিত্রবিদ্যা, ছন্দঃ, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রে কবির স্বচ্ছন্দ বিচরণশীলতা প্রতীত হয় তাঁর রচনা থেকে। বৈদর্ভী রীতির কবি কালিদাসের উপমা অলংকারের প্রতি আকর্ষণ অধিক ছিল। তাই এরূপ প্রবাদ প্রচলিত হয়েছে—'উপমা কালিদাসস্য।' তাঁর প্রতিটি রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে কল্যাণধর্ম ও ত্যাগের মাধুর্য, সত্য-শিব ও সুন্দরের আদর্শ, ভারতীয় সভ্যতার আত্মিক রূপ।

কালিদাস রচিত মহাকাব্য

সংস্কৃতসাহিত্য জগতকে কালিদাস দু'টি মহাকাব্য উপহার দিয়েছেন—কুমারসম্ভব এবং রঘুবংশ। প্রথমটি কবির তরুণ বয়সের এবং দ্বিতীয়টি পরিণত বয়সের রচনা। কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গে রচিত মহাকাব্য। অনেকের মতে এই মহাকাব্যের সপ্তম সর্গে কুমার কার্তিকেয়ের জন্ম (সম্ভব) সূচিত হয়েছে, তাই সপ্তম সর্গ পর্যন্ত কালিদাসের রচনা। অবশিষ্ট সর্গগুলি পরবর্তীকালের সংযোজন এবং এই অংশের রচনারীতি

১. Sanskrit literature, P–323.

Scanned with CamScanner

কালিদাসের রচনার সাদৃশ্যবাহী নয়। মল্লিনাথ এই মহাকাব্যের সপ্তম সর্গ পর্যন্ত টীকা রচনা করেছেন। পরবর্তী সর্গগুলিতে পার্বতী-পরমেশ্বরের যে সম্ভোগচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা কালিদাসের কবিমানসিকতার পরিপন্থী।

হিমালয়ের ভাবগম্ভীর রূপের বর্ণনায় এই কাব্যের সূত্রপাত। গিরিরাজনন্দিনী পার্বতী মহাদেবের অর্ধাঙ্গিনী হবেন—নারদের এই আশীর্বাদে গিরিরাজ হিমালয় কন্যাকে পাঠালেন সমাধিমগ্ন দেবাদিদেবের পরিচর্যায়। এদিকে তারকাসুরের অত্যাচারে নিপীড়িত দেবগণকে ব্রহ্মা আশ্বস্ত করলেন—পার্বতী ও মহাদেবের পরিণয়ে তাঁদের যে কুমার জন্মগ্রহণ করবেন, তিনিই হবেন তারকাসুরের নিহন্তা। যোগমগ্ন যোগীশ্বরের তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্রের আদেশে মদন তাঁর সখা বসন্তকে নিয়ে উপস্থিত হলেন মহাদেবের তপোভূমিতে। সহসা অকাল বসন্তের আবির্ভাবে চারিদিকে যখন সৌন্দর্য ও প্রাণচাঞ্চল্যের সমারোহ, উদ্ভিন্নযৌবনা পার্বতী মহাদেবের পদপ্রান্তে প্রণতা, তখনই কামদেব তাঁর অব্যর্থ পুষ্পশর নিক্ষেপ করলেন মহাদেবকে লক্ষ্য করে। নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় অচঞ্চল মহাদেব মদনের ধৃষ্টতায় চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করলেন, তাঁর ললাটনেত্র সহসা ক্রোধোদ্দীপ্ত হল, মদন ভস্মীভূত হলেন—"তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার" (৩/৭২)। স্বামীর বিয়োগে বিধুরা কামপ্রিয়া রতির করুণ বিলাপে সমগ্র বনভূমিও ক্রন্দনব্যাকুল হয়ে উঠল। পার্বতী ধিক্কার দিলেন তাঁর রূপলাবণ্যের বাহ্য গৌরবকে—"নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতী" (৫.১),। তিনি দুশ্চর তপস্যা দ্বারা তপস্বিশ্রেষ্ঠকে লাভ করার জন্য ব্রতী হলেন। পার্বতীর কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে পাষাণহৃদয় আরাধ্য দেবতা চন্দ্রশেখরমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। অকস্মাৎ হৃদয়েশ্বরকে সম্মুখে দেখে বিস্ময়বিমূঢ়া পার্বতীর অবস্থা তখন—'মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ' (৫.৮৫)। রূপের দ্বারা নয়, তপস্যার দ্বারা পার্বতী তাঁর হৃদয়দেবতার হৃদয়কে জয় করলেন। কল্যাণধর্ম দুটি হৃদয়কে একসূত্রে গ্রথিত করল। মঙ্গলদাতা পার্বতী পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হলেন পরমেশ্বরের সঙ্গে। তাঁদের মিলনে কুমারোৎপত্তির সম্ভাবনা সূচিত হল। এটাই সংক্ষেপে কুমারসম্ভব মহাকাব্যের বিষয়বস্তু। পরবর্তী সর্গগুলিতে হরপার্বতীর দাম্পত্যলীলার ও সম্ভোগের উদ্দাম চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

'রঘুবংশ' মহাকবি কালিদাসের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। আজন্মশুদ্ধ রঘুরাজগণের ধর্মানুমোদিত কীর্তিকাহিনী এই মহাকাব্যে বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থটি ঊনবিংশতি সর্গে রচিত। সূর্যবংশের খ্যাতকীর্তি রাজা দিলীপ থেকে আরম্ভ করে অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত রাজাদের মহত্ত্বমণ্ডিত চরিতবৃত্ত একের পর এক কবি চিত্রিত করেছেন। অপুত্রক রাজা দিলীপ কুলগুরু বশিষ্ঠের উপদেশে তাঁর আশ্রমের কামধেনু নন্দিনীর সেবায় নিযুক্ত হন।। নন্দিনীর বরে রাজা পুত্র লাভ করেন। পুত্রের নাম রঘু। রঘুর রাজ্যাভিষেক, দিগ্বিজয়, বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান,

রঘুর পুত্র অজের জন্ম, অজ-ইন্দুমতীর পরিণয়, দশরথের সিংহাসন লাভ, দশরথের পুত্রলাভ, রাম-সীতার পরিণয়, রামের রাজ্যাভিষেক, বনগমন, রাবণবধ, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, লোকাপবাদহেতু সীতা-নির্বাসন, সীতার পুত্রপ্রাপ্তি, সীতার পাতাল প্রবেশ, কুশের রাজ্যভার গ্রহণ, কুশপুত্র অতিথির জন্ম ও রাজ্যাভিষেক এবং পরবর্তী একবিংশতি রাজার রাজত্বকাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। অন্তিম সর্গে অগ্নিবর্ণের ভোগাসক্ত জীবনের চরম পরিণতি বর্ণনা করে কবি জীবনের কদর্যতার মধ্যে মহতী বিনষ্টির কথা ঘোষণা করেছেন।

'রঘুবংশ' যেন এক বিরাট চিত্রশালা। প্রতিটি সর্গই ঘটনাবৈচিত্র্যে অভিনব ও আকর্ষণীয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদ, গিরি-নদী-নগরীর চিত্রও এই মহাকাব্যে চিত্রিত হয়েছে। রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় এবং ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভার আলেখ্য চিত্রণাবসরে কবি বিবিধ ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করেছেন। রাবণবধের পর অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনকালে রামচন্দ্র পুষ্পক বিমান থেকে সীতাকে যে ভৌগোলিক চিত্রমালা দেখিয়েছেন তা ভারতবাসীর অন্তরে এক গভীর ঐক্যবোধের সঞ্চার করে। এই মহাকাব্যের ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর বর্ণন কাব্যসৌন্দর্যে অতুলনীয়। চতুর্দশ সর্গের সীতাপরিত্যাগ অংশটি করুণরসের বিহ্বলতায় সকলকে আবিষ্ট করে। কালিদাস-প্রতিভার ব্যাপ্তি ও গভীরতা প্রতিফলিত হয়েছে এই কালজয়ী মহাকাব্যে। ভোগ নয়, ত্যাগই হল কল্যাণ, সৌন্দর্য ও মাধুর্যের উৎস—কালিদাসের এই জীবনদর্শনও এখানে অভিব্যক্ত হয়েছে। ঊনবিংশ সর্গে ভোগাসক্ত অগ্নিবর্ণের পতন কাহিনীর মধ্যে কবি সেই চরম সত্যটিকে প্রকাশ করেছেন।

ভারবি

কালিদাসোত্তর যুগের মহাকাব্য-রচয়িতাদের অন্যতম হলেন মহাকবি ভারবি। তাঁর রচিত একটিমাত্র মহাকাব্য কিরাতার্জুনীয় ভারবিকে মহাকবি আখ্যায় ভূষিত করেছে। কালিদাসের পরবর্তীকালে সহজাত প্রতিভার সঙ্গে পাণ্ডিত্যের সমন্বয়ে সংস্কৃত মহাকাব্য রচনার যে নতুন রীতির প্রচলন ঘটে তার পথিকৃৎ হলেন ভারবি। ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত দ্বিতীয় পুলকেশীর 'Aihole Inscription'-এ কালিদাসের সঙ্গে ভারবিও প্রথিতযশা কবিরূপে উল্লিখিত হয়েছেন—"স বিজয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসভারবিকীর্তিঃ।" এই শিলালেখের লেখক রবিকীর্তি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আশ্রিত কবি। দ্বিতীয় পুলকেশীর সময় ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তীকাল। দক্ষিণভারতের কোঙ্গণি নামক এক রাজার দানপত্রে রাজা অবিনীতের দুর্বিনীত নামক এক পুত্রের উল্লেখ আছে, যিনি ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়' মহাকাব্যের পনেরোটি সর্গের টীকা রচনা করেন। খ্রীঃ ৬০০ শতকের কিছু পূর্ববর্তী বা পরবর্তীকাল দুর্বিনীতের রাজত্বকালরূপে চিহ্নিত। পাণিনির

Scanned with CamScanner

অষ্টাধ্যায়ীর টীকাকার জয়াদিত্য বামনের কাশিকাবৃত্তিতে[১] ভারবির উল্লেখ আছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়ে কাশিকাবৃত্তি রচিত হয়। তবে আশ্চর্যের বিষয়, বাণের রচনায় ভারবির কোন উল্লেখ নেই। ভারবি সম্পর্কে বাণের এই নীরবতার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক কীথ মন্তব্য করেছেন—"Bāna ignores him so that he can hardly have succeeded him long enough for its fame to compel recognition[২]." উপরি উক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের সন্নিহিত সময়কে ভারবির আবির্ভাব কালরূপে চিহ্নিত করা হয়।

'অবন্তিসুন্দরীকথা' ও 'অবন্তিসুন্দরীকথাসার' গ্রন্থ দুটি থেকে ভারবির ব্যক্তিজীবন এবং জন্মস্থান সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ভারবির অপর নাম ছিল দামোদর এবং তিনি কৌশিক গোত্রীয় নারায়ণ স্বামীর পুত্র ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্তর্গত আনন্দপুরের অধিবাসী ছিলেন। পরে তাঁরা দাক্ষিণাত্যের অচলপুরে বসতি স্থাপন করেন।[৩] ভারবি কিছুকালের জন্য কাঞ্চীরাজ সিংহবিষ্ণুর পুত্র মহেন্দ্রবিক্রমের রাজসভায় ছিলেন।

একটিমাত্র মহাকাব্য 'কিরাতার্জুনীয়ম্' ভারবিকে লোকোত্তর খ্যাতি দান করেছে। মহাকাব্যটি অষ্টাদশ সর্গে রচিত। মহাভারতের বনপর্ব থেকে কাহিনী আহরণ করে ভারবি তার মহাকাব্যোচিত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন। বনবাসকালে পাণ্ডবেরা যখন দ্বৈতবনে বাস করছিলেন, তখন যুধিষ্ঠিরের দ্বারা নিয়োজিত দূত দুর্যোধনের সুশাসনের বৃত্তান্ত নিবেদন করল। দ্রৌপদী পাণ্ডবদের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এবং সত্বর দুর্যোধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পরামর্শ দিলেন। যুধিষ্ঠির হঠকারিতার অকল্যাণকর পরিণামের কথা চিন্তা করে সময়ের প্রতীক্ষা করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করলেন। ব্যাসদেব অর্জুনকে মহাবিদ্যা দান করলেন এবং পাশুপত অস্ত্রলাভের জন্য তাঁকে ইন্দ্রকীল পর্বতে তপস্যা করতে উপদেশ দিলেন। ইন্দ্রকীল পর্বতে অর্জুনের দুশ্চর তপস্যায় ভীত গুহ্যকদের প্রার্থনায় ইন্দ্র অর্জুনের তপোভঙ্গের জন্য গন্ধর্বদের সঙ্গে অপ্সরাদের পাঠালেন। অপ্সরাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। অবশেষে মুনিবেশধারী স্বয়ং ইন্দ্র এলেন অর্জুনের কাছে। তিনি অর্জুনের সাধু উদ্দেশ্যের কথা জেনে নিজরূপ ধারণ করলেন এবং তাঁকে মহাদেবের আরাধনার উপদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। অর্জুনের দুশ্চর তপস্যায় সন্ত্রস্ত দেবতাদের অনুরোধে মহাদেব কিরাতবেশে অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। আক্রমণোদ্যত একটি বরাহ একই সঙ্গে অর্জুন ও কিরাত উভয়ের বাণে বিদ্ধ হওয়ায় সেই নিহত বরাহকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হল। অবশেষে অর্জুনের বীরত্বে সন্তুষ্ট মহাদেব নিজরূপ ধারণ করলেন এবং অর্জুনের অভীষ্ট পাশুপত অস্ত্র এবং ধনুর্বেদ দান করলেন।

১. পাণিনির "প্রকাশনস্থেয়াখ্যায়োশ্চ" (১.৩.২৩) সূত্রের কাশিকাবৃত্তিতে বলা হয়েছে—"সংশয্য কর্ণাদিষু তিষ্ঠতে যঃ ভারবিঃ।"

২. Keith : HSL, P–109

৩. অবন্তিসুন্দরীকথা, ১৯—২১ সংখ্যক শ্লোক।

Scanned with CamScanner